বাংলার মন্দির, শেষ মধ্যযুগ

প্রণব রায়

প্রাক্-মুসলিম যুগে, বিশেষ করে, পাল-সেন আমলে যে বহু মন্দির তৈরি হয়েছিল, সুলতানী আমলের প্রথম দুই শতকের মধ্যে তার প্রায় সবই ধবংস হয়ে যায়। কিন্তু শেষ-মধ্যযুগে (সুলতানী আমলের শেষ দিককে আমরা 'শেষ মধ্যযুগ' বলতে পারি) অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু আগে থেকে (খ্রি. পনের শতক থেকে) বাংলার নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হতে থাকে (বেশির ভাগই ইঁটের), সেগুলির স্থাপত্যবৈচিত্র্য ও 'টেরাকোটা'-অলংকরণ বাঙালির স্থাপত্য ও শিল্পচর্চায় তার মহান্ উত্তরসূরিরূপে উপস্থিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসেবে মন্দিরগুলি তৈরি হয়নি, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্পচর্চার সার্থক উদাহরণ। যুগ যুগ ধরে পল্লী ও শহর-বাংলার আনাচে-কানাচে, নদীর ধারে কত বিচিত্র শ্রেণীর মন্দিরের জন্ম হোল এবং বহু মন্দিরের দেওয়াল 'টেরাকোটা'য় সজ্জিত হল, সেগুলির সঠিক সংখ্যা আজও নিরূপিত হয় নি। কালের প্রকোপে অজস্র মন্দির-দেবসৌধ অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও এখনও যা আছে, জেলায় জেলায় সমীক্ষা করে তার চোখধাঁধানো সংখ্যা আমাদের বিস্ময়ান্বিত করে।

পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশে শেষ- মধ্যযুগের এই মন্দিরগুলিকে প্রধানত পূর্ব আলোচিত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— 'চালা', 'রত্ন', 'দেউল' এবং 'চাঁদনি-দালান'। চালার মধ্যে একটিমাত্র চালযুক্তকে 'একচাল' বা 'একচালা', দুটি চাল বা 'দোচালা' যাকে 'একবাংলা'ও বলা হয়, আবার দুটি দোচালাকে সামনে-পিছনে যুক্ত ক'রে হয় 'জোড়বাংলা' (বিষ্ণুপুরে কেষ্টরায়ের বিখ্যাত 'জোড়বাংলা')। এর পর চারদিকে চারটি চাল নিয়ে 'চারচালা'। ' চারচালার' ওপর আরও চারটি চাল বসিয়ে 'আটচালা' এবং তার ওপর আরও ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' বসিয়ে 'বারচালা' পর্যন্ত মন্দির দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, 'চালা'-মন্দিরের ধারণাটা এসেছিল বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা ঘর থেকে। শহরে এই চালা বিরল হয়ে গেলেও গ্রামাঞ্চলে সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। 'চালা'-মন্দিরের সঙ্গে 'চাঁদনি' ও 'দালান'-শৈলীর কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও 'চাঁদনি' ও 'দালানের' ছাদ সমতল , কিন্তু চালার চাল ঢালু। কার্নিশ পূর্বোত্তের ক্ষেত্রে বেশির ভাগেরই বাঁকানো হওয়ার বদলে সোজা ভাবটিই লক্ষ্য করা যায়। চাঁদনির থেকে দালানের পার্থক্য স্পষ্ট, আয়তনের দিক থেকে। আকার এক হলেও আয়তন হয়েছে বিশাল ও অনেকগুলি প্রবেশপথ। কলকাতা ও গ্রামাঞ্চলের দুর্গাদালানগুলি লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে 'চাঁদনি' থেকে গেছে মাত্র এক থেকে দুটি প্রবেশপথ নিয়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে, চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্যচিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য; সুপ্রাচীন কাল থেকে এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। চৈতন্যাবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে থেকে মন্দিরে এই রীতির প্রয়োগ দেখা দিল, যা একান্তই হয়ে উঠল এক নতুন স্থাপত্যচিন্তার ফসল। গৌড়ে (মালদহ) 'কদমরসুলে'র কাছাকাছি 'দোচালা' সৌধটি সর্বপ্রাচীন 'চালা'-শৈলীর হিন্দুমন্দির ছিল বলে মনে করা যায়। পরবর্তীকালে এটি ফৎ খাঁনের সমাধিতে পরিণত হয় (১৬৫৭ খ্রি.)। কিন্তু এটি রাজা কংসের সময় (১৪১২-১৪১৫ খ্রি.) একটি হিন্দুমন্দির ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য ঃএম. আবিদ আলি খান, মেমোয়ার্স অভ গৌড় অ্যাণ্ড পাণ্ডুয়া, রিপ্রিন্ট, প ব সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ৫৯)। 'চারচালা'-মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া যায় ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীতে— কর্মকারদের সিংহবাহিনীর 'চারচালা' ও তৎসংলগ্ন চারচালা 'জগমোহন' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৯০খ্রি.)। উল্লেখ্য, এগুলি নেহাতই সাদামাটা মন্দির। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা, 'টেরাকোটা'-অলংকরণের উল্লেখযোগ্য কাকার্য কোন কিছুই এগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থাপত্যকৌশলে নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের গঠনে। বিশেষ করে, ভেতরের ছাদে গোলাকার গ

স্বুজ বা ভল্টের প্রয়োগে।

বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের উচচাকাঙক্ষী পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় 'রত্ন'- শৈলীর মধ্যে। মধ্যযুগীয় মন্দিরস্থাপত্যের চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এই শৈলীর মধ্যে। নিচে চালা, চাঁদনি বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা 'রত্ন'-রূপে বসিয়ে নতুন আলাদা এক শৈলী বা রীতি সৃষ্টি করা হোল। কিন্তু চূড়া বা 'রত্ন' বসাবার একটা শৃঙ্খলা ছিল। এর ফলে উদ্ভব হল, এই 'রত্ন', স্থাপত্যেরই কয়েকটি শ্রেণী— 'একরত্ন', 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', 'একবিংশতিরত্ন' ও 'পঞ্চবিংশতিরত্ন'। সর্বোচচ চারটি তলেই পঁচিশটি চূড়া বসানো হত। 'দেউল'-রীতির যে অজস্র মন্দির দেখা যায়, সেগুলি প্রাচীন 'রেখ' ও 'শিখর' দেউলের রূ পান্তরিত ও সরলীকৃত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ায়তন দেউল মন্দির, যা গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্রই আমাদের চোখে পড়ে। এই ধরনের মন্দির অজস্র লক্ষ্য করা যায়, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, দুই চবিবশপরগনা ও কিছু পরিমাণে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায়।
উল্লিখিত এই মন্দিরগুলি ছাড়া আরও কোন কোন শ্রেণীর মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি, যেগুলি পূর্বোক্ত কোন রীতির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সেগুলি প্রথাগত এই শৈলীর না হলেও আমাদের আলোচ্য নিবন্ধের অন্তর্গত।

এই সব মন্দির পলিমাটিতে গড়া শস্যশ্যামল বাংলার একান্ত নিজস্ব, যা স্থপতিশিল্পীদের নিজহাতে তৈরি, বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকোদ্ভাসিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ইঁটের মন্দিরগুলিতে বহুক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী এবং দেবদেবী-লীলাদৃশ্যের 'টেরাকোটা'-ফলক ছাড়াও সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সামাজিক দৃশ্য এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারার যে জ্বলন্ত ছবি রূপায়িত হয়েছে, তার ফলে 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলির মধ্যে ইতিহাসের মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকর্ষণীয় লিপিফলক। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নয়, অনেক দীর্ঘলিপিতে অজ্ঞাত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেগুলি ইতিহাস-প্রেমী মাত্রেরই গবেষণার বস্তু। মধ্যযুগে মন্দিরসজ্জার জন্য 'টেরাকোটা' একটি পৃথক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীচৈতন্যা বির্ভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, যাকে কেউ কেউ লোকায়ত শিল্প বলে মনে করেন। য ারা মাটির মানুষের কাছাকাছি,তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা এই শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মূর্তিফলকগুলিতে গ্র ামীণ সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি যেমন স্পষ্ট, তেমনই মূর্তিগুলির ভাবভঙ্গি, বেশভূষা ও আকারে রয়েছে সাধারণ ম ানুষের জীবনধারার বিচিত্র প্রকাশ। এই মন্দিরগুলি বাঙালির নিজস্ব কল্পনাতেই সৃষ্ট হয়েছিল। এগুলিকে তাই ধর্মীয় মে াড়কে পোরা 'আফিং' মনে করে তাচ্ছিল্য না করে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, বিদেশে ও আমাদের দেশে যেখানে মসজিদ ও গীর্জাগুলি খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় বর্তমান, সেখানে শিল্পকৃতির এই বিরল নিদর্শনগুলি অবহেলা-অনাদরে ভগ্ন, জীর্ণ ও পরিত্যক্ত হয়ে দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় মানুষদের ঔদাসীন্য আকাশছোঁয়া হলেও সরকারিযন্ত্র এদের সুরক্ষার বিষয়ে অস্বাভাবিক নীরব ও নিঃস্পৃহ। ভ ারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (আরকিওলজিক্যাল সারভে অভ ইন্ডিয়া) বিষ্ণুপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থানের উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির সংরক্ষণের চেষ্টা করলেও রাজ্যসরকারের তরফে আমাদের এই গৌরবময় প্রাচীন নিদর্শনগুলির সুরক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। অপরূপ শিল্পসুষমায় ভরা বহু মন্দিরকে বিধবস্ত হয়ে যেতে অ ামরা দেখেছি এবং খুব শীঘ্র আরও অনেক মন্দির ধবংস হয়ে যাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করা গেছে, মন্দির-দেওয়াল থেকে সুন্দর সুন্দর অজস্র 'টেরাকোটা'-ফলক খুলে তা অন্য জায়গায় বিক্রি করা হয়েছে ও বিদেশে প াচার করা হয়েছে। এই 'ভ্যান্ডালিজম' এর প্রতিবাদ করার কেউ নেই, বরং এই কাজকে খুবই স্বাভাবিক মনে করা হয় এবং এ কাজ যে অতি নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য, তা কারও কখনও মনে হয় না। রাজনীতিক মানুষরা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, মন্দিরের সুরক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কারই 'অপচয়' করার মতো সময় নেই। মাঝে-মাঝে সরকার দায়সারা গে াছের দু একটি মন্দিরের সংস্কার করে কাজ সারে। কিন্তু বেশির ভাগ মন্দিরই কালে কালে ধবংস হতে থাকে। আমরা এইরূপ ধবংসপ্রাপ্ত, ভঙ্গুর এবং জীর্ণ কোন কোন মন্দিরের বিবরণী উপস্থিত করব। তবে তার আগে খ্রিস্টীয় ষোল শতক

থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের এক নতুন ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যেহেতু ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা উভয় বাংলাতে সর্বাধিক এবং পাথরের মন্দির নগণ্য, সেকারণে নদীমাতৃক বাংলার পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে ইঁটের মন্দির ও তার টেরাকোটা-অলংকরণই আমাদের আলোচ্য। একথা সত্য, উত্তরবাংলার তুলনায় দক্ষিণবাংলার চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় বিচিত্র শ্রেণীর ইঁটের অসংখ্য মন্দির দীর্ঘকাল ধরে তৈরি হয়ে এসেছে। এই বিশাল অঞ্চলকে 'বাংলা' মন্দিরের 'হৃদয়ভূমি'-রূপে বলা যায়। নিতান্ত অনাদৃত অবহেলিত বঙ্গসংস্কৃতির এই অমূল্য নিদর্শনগুলি বহু বিদেশীর কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এদেশীয়দের কাছে তা নিতান্তই অবজ্ঞার বিষয়। কিন্তু একসময় এগুলিকে যে এক একটি শিল্পকর্মরূপে গড়ে তোলা হোত, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মন্দির। স্থাপত্য ও টেরাকোটার সূক্ষ্ম কাজ বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে উৎকৃষ্টমানের শিল্পমর্যাদায় ভূষিত করেছে, সে- বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলার মন্দির- 'টেরাকোটা' শিল্পের যে নতুন ধারাটি শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কিছু পরবর্তীকাল থেকে গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অমোঘ প্রভাব। শুধু ধর্মজীবন নয়, বাঙালি-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই এই প্রভাব ছিল অপরিসীম। সাহিত্য ও শিল্পের পুনর্জ্জীবন ঘটল এই সময়ে। মন্দির-স্থাপত্যের পূর্বকথিত শৈলীগুলি এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে। 'টেরাকোটা'-শিল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়। প্রাক-মুসলিম বা প্রাক-সুলতানী আমলে গুপ্তযুগ থেকে পাল-সেন যুগপর্যন্ত 'টেরাকোটা' শিল্পের যে ধারাটি ছিল, তার সঙ্গে চৈতন্য-পরবর্তীকালে 'টেরাকোটা' শিল্পের পার্থক্য সুস্পষ্ট— বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, কাকার্যের সূক্ষ্মতা, টেরাকোটা-ফলকের আকার-আয়তন সর্বক্ষেত্রেই এই পার্থক্য ধরা পড়ে। পালযুগে আনুমানিক নবম শতকে পাহাড়পুরের (রাজশাহি জেলা, বাংলাদেশ) মন্দির-টেরাকোটা ফলকগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এটা চোখে পড়ে। চৈতন্য- পরবর্তীকালে মন্দির দেওয়াল সজ্জার জন্যে টেরাকোটা-ফলকগুলির আয়তন ছোট, বেশির ভাগই ছাঁচে ঢালাই করা— ষোল-সতের শতকে তৈরি টেরাকোটাগুলিতে মূর্তিফলকের সূক্ষ্ম কাজ, সুন্দর নকশা লক্ষ্য করা যায়। টেরাকোটা-ফলকসমূহে রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যই বেশি এবং রামলীলা, মহাভারতের কাহিনী, দশাবতার, পৌরাণিক অন্যান্য কাহিনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩খ্রি.), কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫ খ্রি.) এবং মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪খ্রি.)— এই তিনটি ইঁটের মন্দিরকে সমগ্র বাংলার মধ্যে স্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বলা যায়। বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীউর মন্দিরটিও (পূর্বে এটি 'নবরত্ন'- রীতির ছিল) এই পর্যায়ে পড়ে। এই সব মন্দিরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সজ্জায় অসংখ্য টেরাকোটা- মূর্তি ও নকশাফলক ব্যবহার করা হয়েছে। মেদিনীপুর, হুগলি ও বর্ধমান জেলার বহু মন্দিরেও আমরা সুন্দর সুন্দর টেরাকোটাফলক (মূর্তি ও নকশা) লক্ষ্য করেছি। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুরের দাসপুরের সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬), লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯১), ঘাটাল- নবগ্রামে রায়েদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯), হুগলি জেলার দশঘরা, আঁটপুর, বৈঁচিগ্রাম, গুপ্তিপাড়া এবং বর্ধমান জেলার কালনার মন্দিরগুলির কথা বলা যেতে পারে। বিষয়বৈচিত্র্য, শিল্পসুষমার ক্ষেত্রে উক্ত মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা' অলংকরণ খুবই প্রশংসনীয় এবং শিল্পরসিকদের কাছে বিশেষ আদরের সামগ্রী।